ভারতভাগ-বিরোধী মুসলিম জনমত

দীপাঞ্জন সেনগুপ্ত

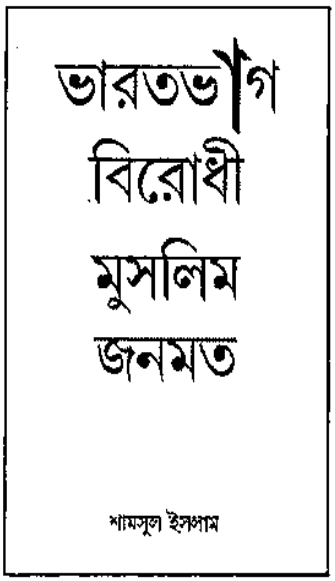

ভারতভাগ-বিরোধী মুসলিম জনমত
শামসুল ইসলাম
ভাষান্তর : চিররঞ্জন সেনগুপ্ত
প্রথম বাংলা সংস্করণ : ২০১৯
কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী ২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০১২
৩০০ টাকা

শামসুল ইসলামের বইটির নাম *Muslims Against Partition of India,* বাংলা ভাষ্যে বর্তমানে যে বইটির এখানে পরিচিতি দেওয়া হচ্ছে, তার নামকরণ করা হয়েছে *ভারতভাগ বিরোধী মুসলিম জনমত*। এখন এই 'Muslims' অর্থাৎ আলোচ্যকালে যেসব বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিবর্গের ও তাদের কর্মকাণ্ডের কথা বলা হয়েছে, ভারতভাগের প্রশ্নে তাদের যুক্তিসিদ্ধ, সুচিন্তিত এবং আপোশহীন বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতভাগ হয়ে যাওয়ায় তাদের কি কোনো প্রাসঙ্গিকতা রইল, না রইল না, এদিকটা যেমন ভেবে দেখা দরকার অন্যদিকে বাংলা ভাষ্যে 'মুসলিম জনমত' শব্দবন্ধের মধ্যে বিশিষ্ট ও সাধারণ ধারাবাহিক জীবনে অভ্যস্ত পুরুষানুক্রমে কৃষিতে, শিল্পে, কলে-কারখানায় ও জীবনযাপনের অসংখ্য প্রয়োজনে নিয়োজিত মুসলিম ভারতবাসীদের ভারতভাগের সিদ্ধান্ত নিরূপণে কতটা সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা ছিল, কিংবা ছিল না এ কথাটাও বুঝে ওঠা দরকার। এ দুটি বিষয়ে আলোচনা করার আগে মূল রচনার মুখবন্ধে জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক হরবংশ মুখিয়া এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক, লেখক স্বয়ং শামসুল ইসলামের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখা কয়েকটি কথা তুলে দিতে চাই।

হরবংশ মুখিয়ার মুখবন্ধের শুরুতেই তিনি লিখছেন :

> অতীত ও বর্তমানকে যে সহজ উপলব্ধির স্তরে আমরা নামিয়ে আনি... এদের মধ্যে আবার যা অতি সাধারণ তা হল আমাদের নিজস্ব বা অন্যের ভাবমূর্তিকে আমরা আলাদা না করে একই রকম সত্তারূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ কুলুঙ্গিতে আবদ্ধ করে রাখি। এভাবেই ভারত বিভাজন ও মুসলমানরা পৃথক বাসস্থান চেয়েছিল বলেই মনে করা হয়, আর হিন্দুরা চেয়েছিল অখণ্ড ভারত।

আর শামসুল ইসলাম ভূমিকাটি আরম্ভ করেছেন এভাবে :

> একথা সত্য যে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য পৃথক বাসভূমির দাবির কারণেই ১৯৪৭ সালে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। এবং একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে মুসলিম লীগ তাদের দাবির সমর্থনে ব্যাপক সংখ্যায় মুসলিম জনগণকে সমবেত করতে সক্ষম হয়। তেমনি একথাও সত্য যে মুসলিমদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ ও তাদের সংগঠন পাকিস্তান দাবির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। ... দুর্ভাগ্যক্রমে একমাত্র মশিরুল হাসানের রচনা ভিন্ন এদের অবদানকে কোথাও স্বীকার করা হয়নি।

বইটি যেহেতু ভারত বিভাজন বিরোধী মুসলিম সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, এবং তাদের সংগঠন ও কর্মকাণ্ড কেন্দ্রিক রচনা সে কারণে লেখক যে বিশাল প্রেক্ষাপট জুড়ে, বলা যেতে পারে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের কাল থেকে ভারতের সমাজ সংস্কারের আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক সংগঠন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা বেয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম, ব্রিটিশ শাসকদের কূটবুদ্ধি ও প্ররোচনার কথা, সবটাই ছুঁয়ে গিয়েছেন। আবার ছুঁয়ে গিয়েছেনও বলা চলে না, বরং বলা যায় যে অলিখিত এযাবৎ কুলুঙ্গিতে অনাদরে অবহেলায় পড়ে থাকা ইতিহাসের উপাদান সেগুলিকে উদ্ধার করে আমাদের সামনে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে তাকে মেলে ধরেছেন, ইতিহাসের ছিন্নগ্রন্থিগুলিকে জুড়ে দিয়ে তার পূর্ণ অবয়বকে ধরার চেষ্টা করেছেন। উঠে এসেছে দেশ ও জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি দ্বিজাতিতত্ত্বের মতো অন্য অনেক প্রশ্নে পরিচিতি ও চেতনার বিষয়ীগত অন্বেষার ভাবনা, যেগুলিকে আবার ফিরে দেখার বাসনা, কারণ বর্তমান সময় আমাদের প্রশ্নোন্মুখ করে তুলছে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম যেহেতু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সে কারণে 'দেশ' বলতে আমরা কী বুঝি তাকে ঝালিয়ে নিতে আমি এখানে ভারতের জন ইতিহাস সিরিজের ৩০ নম্বর খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ১.১ নম্বর টীকা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না—

> ভৌগোলিক এলাকা বিচারে 'দেশ' একটি সাধারণ অভিধা, যেখানে ভাষাগত ভাবে বা সামাজিক ভাবে একটি সমরূপ জনগোষ্ঠী নাও থাকতে পারে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যেমন ভারত। ভৌগোলিক দিকে থেকে (১৯৪৭-য়ের আগে) তাকে পরিষ্কার চিহ্নিত করা যায়— উত্তরে পার্বত্য প্রাচীর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। ঐতিহাসিক ভাবে

> নানাবিধ ভাষা ও বর্ণপ্রথা এখানে বিবর্তিত ও বিস্তৃত হয়ে অঞ্চলটিকে এক বিশ্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মান্যতা এনে দিয়েছে। অশোকের সময় (খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক) তার নাম ছিল জম্বু দ্বীপ, আর কলিঙ্গের খারবেলা রাজত্বের (খ্রিস্টপূর্ব এক শতক) সময় অধিক পরিচিত ভারত নামটি পাওয়া যায়। গ্রীক ও চীনাদের কাছে এই দেশের পরিচিতি ছিল যথাক্রমে 'ইন্ডিয়া' ও ইন-দু নামে, যা আসলে পারসিক নাম 'হিন্দু'-র ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ। আমির খুসরু দিল্লিতে বসে... কাশ্মীরি থেকে তামিল এরকম ভাষাগুলিকে লিপিবদ্ধ করেন।

একই টীকাতে জাতি (Nation) সম্পর্কে ব্যাখ্যাটি দীর্ঘ হওয়ায় তার থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে দেখব যে, 'জাতি সর্বার্থে এমন একটি নাম (Term) যা কিনা অপরিহার্যভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে পৃথক করে তার রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে বিবেচিত হয়।' তাহলে জাতির সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই, আবার জাতীয়তাবাদ কোনো একটি 'দেশের' ধর্ম বা নির্দিষ্ট কোনো ধর্মীয় সংস্কৃতির অর্থ বহন করে না।

> গান্ধীজিও তার 'হিন্দ স্বরাজে' (১৯০৯) বলছেন যে ধর্ম কখনো একটি 'জাতির' ভিত্তি হতে পারে না এবং যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে ভারতে বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের মানুষকে 'ঐক্যবদ্ধ থেকেই বাঁচতে হবে'।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তো বোঝা গেল, তাহলে দ্বিজাতিতত্ত্বটি কী ও কোথা থেকে এল? আলোচ্য বইটির তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইতিহাসের উপাদানগুলি তুলে ধরা হয়েছে। দেশ ও জাতির প্রশ্নে ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমান ভারতবাসীকে পৃথক দুটি জাতিসত্তার কথা বলা হয়েছে এবং মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার জন্ম হয়েছে। মজার কথা এই দুই দলের নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম দিকে কংগ্রেসে থেকেই কাজ করেন। পরে যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরোধ প্রকাশ্যে এসে যায়, তখনই আল্লা বক্সের মতো নেতৃত্ব রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ্যে এসে যান এবং ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের স্বাধীনতা বার্তার ঝান্ডা হাতে সারাভারতের বিভাজন বিরোধী মুসলিম ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনের সম্মিলিত প্রতিরোধী সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন। এমন একটি ঘটনাকে ইতিহাসের ধূলিমলিন ধূসর পাতা থেকে উদ্ধার করে লেখক আজ এক উপযুক্ত সময়ে আমাদের সামনে হাজির করায় তাকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে (৭ম) আল্লা বক্সকে ষড়যন্ত্র করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং সেশন জজ বি বি পেমাস্টারের অবজারভেশন সে ষড়যন্ত্রকে স্বীকৃতি দিলেও প্রমাণাভাবে দোষীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন। কিন্তু ভারত বিভাজনের এই প্রচেষ্টা স্থায়ী হয়নি। পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। তবু এই উপমহাদেশে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের এই প্রচেষ্টার মধ্যে যে উদগ্র আগ্রাসী ধর্মোন্মাদদের আমরা দেখেছি, আজও তারা সক্রিয়, প্রতিনিয়তই

তাদের পদধ্বনিতে কম্পিত, শঙ্কিত আপামর উপমহাদেশবাসী তার মূল্য দিয়ে যাচ্ছে। এখানে ও ওখানে মৃত্যু মিছিল চলছেই।

এমন সময় সমাজ ভাবনার প্রেক্ষাপটে যখন ইতিহাসের পুনরুদ্ধার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, তখন বার বার ইতিহাসের পাতা উলটেপালটে দেখতেই হয়। আর সে কাজটাই আলোচ্য গ্রন্থটিতে শামসুল ইসলাম করে দেখিয়েছেন, যার ফলে বহু ঢক্কানিনাদিত কোলাহলমুখর উচ্চকিত স্বরের যে অনুপান নিয়ত আমাদের গিলতে বাধ্য করা হচ্ছে, সেখানে চোখ খুলে সাম্প্রতিক অতীতের গর্ভ থেকে বিস্মৃতিতে তলিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষার করার জন্য তিনি যে দরজাটি খুলে দিয়েছেন সেখানেই আম জনতা নিজেদের আত্মপরিচয়ের একটি অধ্যায়কে খুঁজে পাবে বলেই বিশ্বাস হয়। ইতিহাস প্রমাণ দাবি করে, প্রমাণাভাবে কল্পনাশ্রয়ী বিবরণ ইতিহাসের জামা গায়ে আমাদের চেতনার মধ্যে ঢুকে অন্ধ করে ছেড়ে দেয়। আমরা মিথোপজীবী হয়ে পড়ি। আর এই মিথ বা কল্পকাহিনি আমাদের উপলব্ধিকে যতই সত্য ও মিথ্যার বুনোটে তৈরি এক দুর্ভেদ্য জালের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, ততই সেখান থেকে বেরিয়ে আসাটা কষ্টকর হয়ে পড়ে। গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ে মুসলিম লীগের ধর্মান্ধ আচরণ ও হিন্দুত্বের গরিমার সংঘাত ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে, আর ব্রিটিশের কূটকৌশল কীভাবে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী হিন্দু ও মুসলিম নেতৃবৃন্দকে কখনো কখনো বিভ্রান্তির শিকার করে তুলেছিল সেই চিত্র সামনে তুলে ধরেছে। ১৯৩১ সালে মুসলিম লীগ বিরোধীদের ভয় দেখাবার জন্য মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড (এম এন জি) নামে একটি আধা সামরিক বাহিনী তৈরি হয়, তারা সারাভারত জুড়ে পাকিস্তান দাবির পক্ষে বিভাজন বিরোধী সভা, সমিতি ও ব্যক্তিবর্গের উপর প্রশাসনের মদতে আক্রমণ চালিয়ে খুন, জখম, ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়ে তাদের নিরুদ্যম করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। এদিকে আরএসএস-ও বসে ছিল না। তারাও অখণ্ড ভারতের দাবিতে কংগ্রেসের মধ্যে ও বাইরে মুসলিম বিরোধী প্রচার ও ষড়যন্ত্র চালিয়ে গিয়েছিল। এমনকী ১৯৪৭ সালে বিভাজন কালের ঠিক আগে ও পরে উভয় খণ্ডেই যে সাম্প্রদায়িক গণহত্যা বিশ্বের বৃহত্তম গণহত্যা বলে বিবেচিত হয়, সে বিষয়ে যুক্তপ্রদেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রসচিব রাজেশ্বর দয়ালের আত্মজীবনীতে লেখা একটি ঘটনার উল্লেখ আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখতে পাই। এরকম অজস্র ঘটনা, স্লোগান, ষড়যন্ত্র ও পরস্পর বিরোধী অবস্থান আমাদের বিহ্বল করে দেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান আত্মবলিদানের উজ্জ্বল প্রদীপ শিখার নীচে জমাট বাঁধা অন্ধকারের ভয় আজও আমাদের তাড়া করে ফিরছে, পাশাপাশি প্রতিরোধের আলোক শিখাও অভয় দিয়ে যাচ্ছে। শুভাশুভের এ লড়াই যে এখনও বহমান এই অখণ্ড ভারত উপমহাদেশে, সে বিষয়েও লেখক উপসংহারে বার বার আমাদের সচেতন করেছেন।

বইটির প্রতিটি অধ্যায় প্রামাণ্য উদ্ধৃতি ও মূল্যবান টীকা সংবলিত হওয়ায় পাঠকের উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করে।